বাঙালির ইতিহাস চর্চার চৈতন্য ও সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রবণতা ঃ পরিপ্রেক্ষিত উনিশ-বিশ শতক

আইরীন আহমেদ*

সারসংক্ষেপ: *বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস চর্চার চৈতন্যের সূচনা হয় ঔপনিবেশিককালে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির প্রভাবে চিরায়ত ভারতীয় বাঙালি জীবনে উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয়। যার প্রভাব উনিশ-বিশ শতকের ইতিহাস চর্চাতেও পড়ে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদভিত্তিক চৈতন্যের ফলে এসময় ইতিহাস চর্চা হয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। যা কোনভাবেই ইতিহাস রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাছাড়া একজন ঐতিহাসিকের 'নৈর্ব্যক্তিক' থাকার বৈশিষ্ট্যের সাথেও সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চর্চা সাংঘর্ষিক। আলোচ্য প্রবন্ধে উনিশ-বিশ শতকে কী রূপে সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রবণতা বাঙালির ইতিহাস চর্চায় অনুপ্রবেশ করে, সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। পাশাপাশি বস্তুতপক্ষে একজন ঐতিহাসিক ও তাঁর ইতিহাস চর্চার মানদণ্ড ও কাঠামো কী হওয়া উচিত, সেটি নিয়েও আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ: বাঙালি, ইতিহাস চর্চা, চৈতন্য, সাম্প্রদায়িকীকরণ, জাতীয়তাবাদ।

ভূমিকা

ইতিহাস হলো দর্পণের মতো। অতীতের ঘটনাসমূহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। তাই অতীত জানা না থাকলে বর্তমানকে সুসংহত ও সুগঠিত করে সুন্দর ভবিষ্যত নির্মাণ করা যায় না। ইতিহাস জানা কিংবা পাঠের ব্যাপারে সাধারনের মধ্যে একটি অনাগ্রহ কাজ করলেও পৃথিবীর ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়- যে জাতি তার অতীত ইতিহাসকে জেনেছে এবং মূল্যায়ন করেছে, সেই জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। আর ইতিহাস রচনার দায়িত্ব ঐতিহাসিকদের ওপর বর্তায়, আক্ষরিক দিক বিবেচনায় ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলা না গেলেও ইতিহাস রচনার কিছু রীতি-নীতি ও কাঠামো রয়েছে। যার প্রথম কথাই হলো - একজন ঐতিহাসিককে 'নৈর্ব্যক্তিক' অর্থাৎ নিরপেক্ষ হতে হয়। কিন্তু মানুষ মাত্রই তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং ঐতিহাসিকগণও তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণার ওপর আশ্রয় করেই ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর জ্ঞান-অনুভূতি ও চিন্তাপ্রসূত এই রচনাটি উক্ত ঐতিহাসিকের ইতিহাসের দর্শন হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। এই ধারাবাহিকতায় ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিকের রচনায় ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস গড়ে ওঠে। এই দার্শনিক ভিন্নতার কারণেই একই ঘটনার বিবরণই এক এক যুগে এক এক ঐতিহাসিকের বিভিন্ন দার্শনিক ভিত্তির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে মূল্যায়িত হয়। তাইতো ইতালীয় পণ্ডিত বেনেদিত্তো ক্রোচে (Beneditto Croce) এই বিষয়টি পর্যালোচনা করে - 'সব ইতিহাসই সমকালীন ইতিহাস' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কেননা প্রত্যেক যুগেই কোন না কোন ঐতিহাসিক তাঁর নিজস্ব দর্শন দিয়ে অতীতকে বর্তমানের দর্পণ হিসেবে সামনে নিয়ে আসেন। (তরফদার, ২০১১: ভূমিকা) সুতরাং বাঙালির ইতিহাস চৈতন্যের প্রশ্নের সাথে তার দার্শনিক ব্যাখ্যাও সমভাবে জড়িত। আলোচ্য প্রবন্ধে উনিশ ও বিশ শতকে বাঙালির ইতিহাস রচনার যে চৈতন্যের উদ্ভব হয়েছিল, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে এবং বাঙালি ইতিহাসের চৈতন্যে যে জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ও বিস্তার ঘটেছিল, সেই বিষয়টিও পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হবে।

---

* সহকারী অধ্যাপক (ইতিহাস), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর -১৭০৫।

উদ্দেশ্য

প্রাচীনকাল থেকে নানা ধর্ম ও জাতির বসবাস এই উপমহাদেশে থাকলেও 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এই কথাটি ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগে এসে ইংরেজ শাসনের প্রভাব হিসেবে এ অঞ্চলে কট্টর জাতীয়তাবাদী চেতনার সূচনা হয়। যা এ অঞ্চলে বিভেদ সৃষ্টি করে। এ প্রবন্ধ রচনার মূল উদ্দেশ্য হলো- উনিশ-বিশ শতকে বাঙালির ইতিহাস রচনার চৈতন্যের ধরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা, এসময় পূর্ববর্তী ইতিহাস চর্চার ধরণ থেকে এর পার্থক্য চিহ্নিত করা এবং চিরায়ত ঐক্যের মধ্যে কীভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প জায়গা করে নিলো ও বাঙালির ইতিহাস চর্চায় কী প্রভাব ফেললো- সেই বিষয়কে উপস্থাপনের চেষ্টা করা।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধটি দ্বৈতয়িক বা গৌণ উৎস ভিত্তিক এবং ব্যাখ্যা গবেষণা বা Explanatory Research পদ্ধতিতে রচিত। আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইতিহাসের বিজ্ঞানভিত্তিক কাঠামো অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রকাশিত গ্রন্থ, জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, দলিল-দস্তাবেজ, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। তাছাড়া এ প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত উৎসসমূহ পর্যালোচনা করে তথ্যের শুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

আধুনিক যুগের সূচনালগ্ন থেকেই বাঙালি মনন ও মানসে ইতিহাস রচনার প্রবৃত্তি শুরু হয়। এ যুগের পূর্বেও ইতিহাসধর্মী রচনা রচিত হলেও সেগুলোকে প্রকৃত ইতিহাস বলা যায় না। বস্তুত নিজের ধর্ম ও নিজ জাতিকে উচ্চতর অবস্থানে তুলে ধরার প্রয়াস থেকেই বাঙালি ইতিহাস রচনা শুরু করে। সুতরাং এ সময়ের ইতিহাস চর্চার ধারা ও ধরনকে অনুধাবন করতে এ বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিক দাবি রয়েছে বলে মনে করা যায়।

প্রকাশনা পর্যালোচনা

উনিশ ও বিশ শতকের ইতিহাস চর্চার ধারায় সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রবণতা সম্পর্কে যথাযথ কোন প্রকাশনা পাওয়া না গেলেও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর তাঁর গবেষণা গ্রন্থ *বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা*-তে **১৯০১** থেকে **১৯৫০** পর্যন্ত বাঙালি ঐতিহাসিক ও তাদের গবেষণাকর্মের পুর্নপাঠ করেছেন। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে তিনি প্রত্যেক ঐতিহাসিকের ইতিহাস রচনার সীমাবদ্ধতা আলোচনা করতে গিয়ে তাদের জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিষয়টিকে অল্প পরিসরে তুলে ধরেছেন। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম ও কাজল বন্দোপধ্যায়ের সম্পাদনায় রচিত *বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি ঃ ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সংকট* গ্রন্থে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে বাঙালি ইতিহাস চর্চার ধারায় সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রবণতাগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বদরুদ্দীন ওমরের *বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চা*- গ্রন্থটিতে **১৩**টি প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত সময় কালের ইতিহাস চর্চা ও কবে, কখন এবং কীভাবে বাঙালির ইতিহাস চর্চায় সাম্প্রদায়িকীকরণের মতো বিষয়টির অনুপ্রবেশ ঘটলো, সেই ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। গৌতম নিয়োগীর *ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা* গ্রন্থে ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চায় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। বদরুদ্দীন ওমরের *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ* **২** গ্রন্থ হতে মুসলমানদের আত্মপরিচয়ের সংকট কীভাবে তাদের কট্টর জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে, সেই বিষয়ে আলোচনাসহ বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনা ও তার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্তের *ইতিহাসের মুক্তি* গ্রন্থটি থেকে ইতিহাস রচনাকাঠামো সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। একই ধরনের আলোচনা করেছেন

রোমিলা থাপার তাঁর *পূর্বকাল ও পূর্বধারণা* গ্রন্থটিতে। তাছাড়া বিনয় ঘোষের *বাংলার নবজাগৃতি* গ্রন্থটিতে বাঙালি সমাজ ব্যবস্থার নিশ্চল রূপের হঠাৎ অভিঘাত হিসেবে ঔপনিবেশ শাসনের সময়কালকে ধরা হয়েছে। আলোচনার প্রয়োজনে গ্রন্থটি থেকে তথ্য গ্রহণ করতে হয়েছে। একইভাবে মুনতাসীর মামুন তাঁর *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ* গ্রন্থটিতে উনিশ শতকের বাংলাদেশের সামগ্রিক সমাজ জীবনকে তুলে ধরেছেন, যা আলোচ্য প্রবন্ধে তথ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

ইতিহাস রচনার রীতি

উনিশ ও বিশ শতকে বাঙালির ইতিহাস চর্চার চৈতন্য ও এই ধারাটি কেমন ছিল, সে সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রকৃত ঐতিহাসিকের দ্বারা লিখিত ইতিহাস রচনার রীতি কেমন হওয়া উচিত, তা জানা জরুরি।

ইতিহাস অতীত ঘটনার বিবরণ হলেও সেটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, কল্পনা, রাগ-অনুরাগ কিংবা বিরাগের উর্ধ্বে উঠে অতীতের খাঁটি সত্য হওয়া উচিত। সাধারণত মানুষ কাল্পনিক, পৌরাণিক, কিংবদন্তী কিংবা উপাখ্যান পড়তে যতটা আগ্রহী ইতিহাস পাঠে ততটা আগ্রহী নয়। স্বভাবগতভাবেই মানুষ কাহিনীতে বা বিবরণে রঙ-চঙ পছন্দ করে কিন্তু ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য তা নয়, বরং ইতিহাসের মূল লক্ষ্য অতীতের আদালতে বসে বর্তমানের পথ দেখানো, সমাজ ও গোষ্ঠীর চলাচলের পথ ও বিপথ দেখিয়ে মানুষকে সাবধান করা। (গুপ্ত, ১৯৫৭ : ১৫), সমাজ ও সভ্যতার পতনের বন্ধুর পথে মানুষের যাত্রা ও যাত্রা শেষের দিক-দর্শন হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাস কাহিনীকার নয়, ইতিহাস হলো উপদেষ্টা (পূর্বোক্ত, ১৯৫৭ : ১৬)

থুকিডিডিস তাঁর ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও রচনারীতির কথা বলেছেন-

> "...আমার বিবরণে গল্প ও কল্পনার মিশাল নেই, সেজন্য হয়তো তেমন সুখপাঠ্য নয়। তবে তাদের তৃপ্তি দেবে যারা অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ ভালবাসেন।" (পূর্বোক্ত, ১৯৫৭ : ৩১)

তাই ইতিহাসের রীতি কেমন হওয়া উচিৎ, এ ব্যাপারে অতুলচন্দ্র বলেন-

> ঐতিহাসিক যে ইতিহাসই রচনা করেন নিকট কি দূর অতীতের তিনি তাঁর ঘটনাকে দেখেন নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে। সে দৃষ্টিকোণ মোটের উপর তার সমসাময়িক কালের বিশ্বাস ও বিচার বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ। ফলশ্রুতিতে ইতিহাস রচনায় প্রকৃতপক্ষে কোন নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ নেই, যা আছে তা হচ্ছে ঐতিহাসিকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ। তবে কেউ কেউ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অতি অপরিচিত সত্যের মর্মস্থান দেখে। কিন্তু এ ধরনের ঐতিহাসিকের সংখ্যা খুবই কম। (পূর্বোক্ত, ১৯৫৭ : ৪৩)

ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে অন্য ঘটনার যোগসূত্র স্থাপন করাই একজন প্রতিভাবান ঐতিহাসিকের কাজ হওয়া উচিত। কারণ-

> যে ঐতিহাসিক তাঁর কল্পিত ইতিহাসের ধারণার সংঙ্গে কোন ঘটনার যোগ দেখতে পান না তাঁর ইতিহাসে স্বভাবতই সে ঘটনার স্থান নেই। প্রতিভাবান ঐতিহাসিক অনেক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার ঐতিহাসিক যোগ দেখতে পান। সাধারন ঐতিহাসিকেরা যা চোখ এড়িয়ে যায়। (পূর্বোক্ত, ১৯৫৭ : ৫৪-৫৫)

এখান থেকে উত্থাপিত হয় বৈজ্ঞানিক ইতিহাস চর্চার কথা। যদিও বলা হয়ে থাকে যে,

> ইতিহাস বিজ্ঞান নয়, কিন্তু সত্যে পৌঁছিবার বাঁধা রাস্তা যেমন বিজ্ঞানেরও নাই। তেমনি ইতিহাসেরও নাই। ঐতিহাসিকের আসল কাজ ধ্বংস করা নয়, গড়া। সত্য অনুসন্ধানের একটা অসম্ভব আদর্শ খাড়া করিয়া কিছুই বিশ্বাস করি না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিলেই যে ঐতিহাসিক সত্য আসিয়া হাতে ধরা দিবে। এমনও বোধ হয় না। (পূর্বোক্ত, ১৯৫৭ : ৯৩-৯৪)

তাই ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের কাজ হচ্ছে,

> যা ঘটে আছে সেই ঘটনার তথ্য নির্ণয় ঐতিহাসিক সত্য নয়, প্রত্নতত্ত্ব মাত্র। ঐতিহাসিকের সবচেয়ে বড় কাজ প্রত্নতত্ত্বের তথ্য থেকে এই ঐতিহাসিক সত্য বা তত্ত্বের আবিস্কার করা। প্রতি ইতিহাসের মধ্যেই কোন না কোন তত্ত্ব আছে। যথার্থ ঐতিহাসিকের চোখে সে তত্ত্ব ধরা পড়ে। ইতিহাসের যে উপদেশ তা ইতিহাস থেকে মানুষের মনে আসে না, মানুষ নিজের মন থেকে ইতিহাসে তা আরোপ করে। (পূর্বোক্ত, ১৯৫৭ : ১০৩)

ইতিহাসকে ব্যবহার করা হয় আত্মপরিচয় খুঁজে বের করার তাগিদে। প্রতিটি যুগে প্রতিটি গোষ্ঠী অতীতের মাঝে নিজের আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ করে, এই আত্মপরিচয় বহুধাবিভক্ত হবার ফলে অতীতের স্বরূপটিও বিকৃত হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের মূল উদ্দেশ্য হলো সমগ্র জনসমষ্টির সামগ্রিক কর্মই যা ইতিহাসকে সৃষ্টি করে এবং অতীতকে তার মূর্ত বাস্তবস্বরূপ ব্যাখ্যার নিকটাবর্তী পৌঁছাতে সাহায্য করে।

এই পৌঁছানোর সাথে জড়িত থাকে সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রশ্ন। কেননা, ইতিহাস শুধুমাত্র কয়েকজন শাসক ও যোদ্ধাদের কাহিনী বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইতিহাস একটি ভূখন্ডের সমগ্র মানুষকে, সমস্ত সমাজকে জানতে ও বুঝতে চায়। মানুষ ও সমাজ কি করছে তা জানার সাথে সাথে সেই মানুষ ও সমাজের পশ্চাতে যে চিন্তা চেতনা নিহিত, ঐতিহাসিক তাকেও অনুসন্ধানে উদ্যোগী হন। (আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, মযহারুল ইসলাম, ১৯৭৪ : প্রসঙ্গ কথা)

ইতিহাসের ধারা বহুবিধ চিন্তাকে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করে। বহুবিধ ভাব বা চেতনা একই সঙ্গে যে চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে ইতিহাস তার সমাধানে অগ্রসর হয়। ইতিহাসকে কেবলমাত্র মানব কর্মকান্ডের উৎস নির্ণয় ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আবদ্ধ রাখা যায়না। তাকে প্রবেশ করতে হয়, সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব এবং শ্রেণী সংগ্রামের পটভূমিতে। (পূর্বোক্ত, ১৯৭৪: প্রসঙ্গ কথা)

সত্যান্বেষণে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে ইতিহাস যেমন বিজ্ঞান, পতন অভ্যুদয়ের কাহিনী থেকে মানুষের যাত্রা পথের দিক নির্ণয় যেমন দর্শন, তার লিপিবদ্ধরূপ তেমনই সাহিত্যকর্ম। (পূর্বোক্ত, ১৯৭৪ : ৪) ইতিহাসের ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য দৃষ্টি থাকা ঐতিহাসিকের কর্তব্য। দৃষ্টির এই স্বচ্ছতা না থাকলে ঐতিহাসিকের বিবরণ অশুদ্ধ, বিকৃত ও পক্ষপাতিত্বমূলক হতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে হ্যারল্ড হুইলার (Harold Wheeler) বলেছেন, History is study of men is action. (পূর্বোক্ত, ১৯৭৪ : ৭)

ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণ প্রদানই ঐতিহাসিকের একমাত্র লক্ষ্য নয়। মানুষ বা সমাজ যে কর্মকান্ড করে এবং এই কর্মকান্ডের পেছনে যে চিন্তাচেতনা ক্রিয়াশীল থাকে তার কারণ ও ব্যাখ্যা দানই ইতিহাসের মূল

কথা। এপ্রসঙ্গে হেগেলের মতবাদ যথার্থ, তিনি বলেন, All history is history of thought. (পূর্বোক্ত, ১৯৭৪ : ৫)

বাঙালির ইতিহাসের চৈতন্যে ও চর্চার ধরন ঃ (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

প্রাচীনকালে লিখিত ইতিহাস চর্চার তেমন ঐতিহ্য ছিল বলে মনে করা যায় না। তবে তখন যে লিখিত আকারে কিছু হতোনা এমনটি নয়। প্রাচীনকালে অনেক লিখিত উৎস বর্তমানে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে জীবনী গ্রন্থ কিংবা সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন, অশ্বঘোষ এর *‘বুদ্ধচরিত’*, বাণভট্টের *‘হর্ষচরিত’*, কৌটিল্যের *‘অর্থশাস্ত্র’*, বাৎসায়নের *‘কামসূত্র’* ইত্যাদি তৎকালীন সময়ের আকরগ্রন্থ। এছাড়া কিছু বিদেশি পরিব্রাজক; যেমন- হিউয়েন সাঙ, ফা-হিয়েন; এদের রচনাবলী থেকেও প্রাচীন যুগের ভারত এবং সে সূত্র ধরে বাংলা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তবে, বাবর কিংবা জাহাঙ্গীরের মতো প্রাক-মুসলিম যুগের ভারতীয় সম্রাট কেউ আত্মজীবনী লিখেছেন বলে জানা যায়নি। যদিও সম্রাট অশোক সারা ভারত জুড়ে শিলালিপি মুদ্রিত করেছিলেন। (ওমর, ২০১৪ : ৪৮)

ভারতবর্ষে মুসলমানরা বিশেষ করে মুঘলরা ইতিহাস বিষয়ে বেশ সচেতন ছিলেন। বাবরের আত্মজীবনী ইতিহাস বিখ্যাত। এই গ্রন্থে তৎকালীন ভারত, আফগানিস্তান, তুর্কী দেশের নানা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও সামাজিক অবস্থার সুনিপুণ বিবরণ রয়েছে। আবার হুমায়ুন নিজে কিছু না লিখলেও তাঁর বোন গুলবদন বেগম লিখেছিলেন *‘হুমায়ুননামা’*। হুমায়ুনের খাবার পানি, গোসলের পানি, শৌচকার্যের পানিসহ যাবতীয় পানি বিষয়ক তদারককারী ছিলেন জওহর আফতাবচী। তাঁর রচিত হুমায়ুনের জীবনীগ্রন্থ *‘তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত’*। আকবরও নিজে কিছু লেখেননি, কিন্তু তাঁর মন্ত্রী আবুল ফজল লিখেছিলেন *আইন ই আকবরী* ও *আকবরনামা*। এছাড়া আকবরের সময়ে টোডরমলের পরিচালনায় যে জরিপ হয়েছিল তার রিপোর্টও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান। জাহাঙ্গীর এর বিখ্যাত আত্মজীবনী *‘তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী’*। ভারতের ভূমি, সেচব্যবস্থা, কর ও শাসনব্যবস্থার ওপর মূল্যবান গ্রন্থ *‘ফতোয়া-ই-আলমগীর’*। এছাড়া আত্মজীবনী ছাড়াও এসময় অনেক ঐতিহাসিকই রচনা করেছিলেন তৎকালীন ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ। এগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলার ওপর লিখিত ইতিহাস মীর্জা নাথান এর *‘বাহারিস্তান-ই-গায়েবী’*। এটি সম্রাট জাহাঙ্গীর এর আমলে রচিত হয়। ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হুসাইন খান এর *‘সিয়ার-ই-মুতাখখিরীন’* এ আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পরবর্তী পর্যায় থেকে আলীবর্দী খাঁর সময় পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (পূর্বোক্ত, ২০১৪ : ৪৯)। শুধু মুঘল আমলেই নয়, মুঘলপূর্ব মুসলিম শাসনের সময়ও অনেক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। যেমন- আল বিরুনীর *তারিখ উল হিন্দ*, মিনহাজ উস সিরাজ এর *তবকাত-ই-নাসিরী*, জিয়াউদ্দিন বারানীর *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী* ইত্যাদি। (পূর্বোক্ত, ২০১৪ : ৪৯)

প্রাচীন কাল থেকে মুঘল আমলের শেষ পর্যন্ত যেসব রচনা রচিত হয়েছে, সেগুলো সম্রাট ও রাজা-রাজরাদের প্রশস্তি বা গুনকীর্তন মূলক রচনা। এসময় ইতিহাস বিকৃতি ও সাম্প্রদায়িকীকরণের ওপর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে- এমনটা খুবই বিরল। বরং মুসলিমরা এ অঞ্চলে এসে স্থানীয়দের সমাজ-সংস্কৃতির অনেক কিছু নিজের করে নিয়েছিল। পাশাপাশি স্থানীয়রাও মুসলমানদের সাথে চলতে চলতে তাদেরকে মেনে নিয়েছিল এবং সহাবস্থান করে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলেছিলো।

বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস চর্চার চৈতন্যের সূচনা

বাঙালীর ইতিহাসের চৈতন্য নিয়ে কথা বলতে গেলে যে সমালোচনা সবচেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে তা হলো, ইতিহাস চেতনাবিহীন বাঙালির ইতিহাস ছিলনা বহুকাল পূর্ব পর্যন্ত। যা হিন্দু ও মুসলমান উভয় বাঙালির জন্য লজ্জাজনক বিষয়। ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন ব্রিটিশ জাতি বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় **১৭৫৭** সালে এবং তাদের ইতিহাস জিজ্ঞাসা বাংলার ইতিবৃত্ত রচনার পথ নির্মাণে মনোযোগী হয় এবং প্রায় পরবর্তী এক শতাব্দীকাল ধরে তারা সে দায়িত্বভার বহন করে।

ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষের অনেকটা নিশ্চল সমাজকাঠামোতে হঠাৎ বিপরীতমুখী পরিবর্তনের সূচনা হয়। কেননা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সর্বদাই বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। এই উপমহাদেশের জনগণের মাঝে বহুবিধ বিশ্বাস রোপিত। জাতিকাঠামো ভিত্তিক ভারতীয় সমাজ চিরদিনই একই রকম থেকেছে। বহুদিনের এই চর্চা ভারতীয় সমাজকে কিছুটা অত্যাচারী ও পরিবর্তন বিরোধী করে তুলেছে। এখানে একটি বিশ্বাস প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল যে- ভারতীয় সমাজ একটি আদর্শ সমাজ, এতে কোন অশান্তি, নৈরাজ্য বা সামাজিক দ্বন্দ্ব নেই। এই ধরণের বিশ্বাস ভারতে প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের সূচনা করেছিল। কিন্তু প্রতীচ্য সবসময়ই ঘোর পার্থিব। জাতি বা Nation এর ধারণা প্রকৃত অর্থে ইউরোপীয় সমাজ থেকেই আগত। উনিশ শতকের উপযোগবাদীরা ভারতের অনগ্রসরতার জন্য যুক্তিহীনতা, বিচার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, সামাজিক জড়তা ও স্বৈরতন্ত্রকে দায়ী করেছেন। (চট্টোপধ্যায়, ১৯৭৭ : ২)

এ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিক্ষা, বাণিজ্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। রেল যোগাযোগ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটায় এবং এতদিনের যে স্থবিরতা ও নিশ্চলতার উপস্থিতি ভারতীয় সমাজে ছিল, তার অবসান ঘটায়। (মামুন, ২০০৬ : ৭৭)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার 'কালান্তর'-এ ভারতের অচলায়তন ভাঙ্গার পক্ষে কথা বলেছেন-

> একদিন চন্ডীমন্ডপে আমাদের আখড়া বসত, আলাপ জমত পাড়পড়শিদের জুটিয়ে, আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামের সীমার মধ্যেই বন্ধ।
>
> বাইরে থেকে প্রথম বিবুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু সে মুসলমান ও প্রাচীন প্রাচ্য। সে ও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজসংঘটন করেছে কিন্তু তার চিত্তে সৃষ্টি বৈচিত্র্য ছিল না।
>
> তারপরে এল ইংরেজ, কেবল মানুষরূপে নয়, নব্যয়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে। মানুষ যে কোন একটি স্থান, চিত্ত মনকে। আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে-তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগ-বিয়োগের সমস্যা।
>
> ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে– কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূরতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে আর কোন বিদেশি জাত কোনদিন এমন করে আসতে পারনি। (ঠাকুর, হোসেন, ২০০১ : ১৯-২০)

এই যে কাছে আসার প্রক্রিয়া, এর ফলে সমাজের পূর্বের পুরো কাঠামোটিই ভেঙ্গে পড়ে। আধুনিক শিল্প বিকাশের পথ ও কিছুটা প্রশস্ত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক আবার একে সমাজের বুকে নতুন এক বিপ্লব বলেও আখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

আবার ইতোমধ্যেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে ইতিহাসবোধ সঞ্চারিত হতে থাকে। এই চেতনাকে জিজ্ঞাসায় পরিণত করতে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার ফলে বাংলার ইতিহাস বাঙালির কাছে পূর্ণাঙ্গরূপে না হলেও অনেকটা সুষ্ঠুভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্কিম লিখেছেন,

> বাঙালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গলার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙালার ভরসা নাই।
>
> কে লিখিবে?
>
> তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে, যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?
>
> আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। (চট্টোপধ্যায়, ১৯৯১:৩৩৭)

এসময় থেকেই জাতীয়তাবাদী চেতনার শুরু হয় এবং বাঙালি অনুধাবন করতে শুরু করে যে, ইতিহাসের জ্ঞানই পারে জাতীয় সংগ্রামে জয়লাভের একমাত্র হাতিয়ার হয়ে উঠতে। তাই স্বদেশের ইতিহাস শিক্ষাকে সমগ্র জাতির মধ্যে অব্যর্থভাবে সঞ্চার করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদের মননে স্বদেশের ইতিহাসবোধের সৃষ্টি এবং বাংলার ইতিহাসকে শিক্ষণীয় বিষয়রূপে প্রবর্তিত করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে দেশীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ও তার বিকাশ হতে পারে। (সেন, দত্ত সম্পা. ১৯৯২ : ১)

বাঙালি ইতিহাস চর্চায় জাতীয়তাবাদী চেতনার সূচনা

আপাতদৃষ্টিতে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এ অঞ্চলে আধুনিকতার সূচনা করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু স্থবির ভারতীয় সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে একে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে ধাবিত করতে হলে প্রয়োজন দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তি। সুতরাং এদিক পর্যালোচনায় বলা যায়, ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনেই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে তৎপর হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে, ভারতীয়রা পার্থিব জীবনের চেয়ে পরকালেই বেশি মনোযোগী। স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাশাপাশি সহাবস্থান করলেও ইংরেজ আগমনের পর জাতীয়বাদী চিন্তাধারা উন্মেষের পূর্ব পর্যন্ত ধর্মীয় পরিচয়ই ছিল এদেশের মানুষের স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা যা যুগ যুগ ধরেই ছিল, ইংরেজ, শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থার কারণে তা তো মুছে যায়নি। বরং তা আরো আবেগমথিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিলো। (ইসলাম ও বন্দোপাধ্যায়, আহমদ ১৯৯৯ : ২১৫)

সুতরাং বিদেশী শাসকদের লেখা ইতিহাসে পরাধীন জাতি তারা নিজের কথা খুঁজে পাবেনা, নিজেদের ইতিহাস নিজেদেরই লিখতে হবে- জাতীয়তাবাদের এই ছিলো প্রাথমিক শ্লোগান। (চট্টোপাধ্যায়, ২০১২ : ১৩২) দেশ বা জাতি, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্র - আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসের এ তিনটি ধারণার মধ্যে যে সম্পর্ক; ইউরোপীয় ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি চর্চার মাধ্যমে শিক্ষিত বাঙ্গালীয় মধ্যেও ইতিহাস চর্চার

একই ধারা গড়ে উঠে। জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক প্রকল্প হলো একটি বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র, জাতীয় আধুনিকতার জন্ম দেয়া। (পূর্বোক্ত, ২০১২ : ১৮২)

এ সময়ই হিন্দু লেখকদের হিন্দু রাজাকে বীর আবার মুসলমান লেখকের মুসলিমক শাসককে বীর মনে করে সাহিত্য কিংবা ইতিহাস রচনা শুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে সর্বদাই ক্ষোভ ছিল যে, ইংরেজরা হিন্দু শাসকদের পরাজিত, ভীরু শাসক হিসেবে উপস্থাপন করছে, তাদের উদ্যোগে রচিত গ্রন্থসমূহে। তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেও ইতিহাস রচনা করেননি। তবে ইতিহাস রচনায় তাগিদ দিয়েছেন। কারণ তিনি জানতেন যে বাঙালির ইতিহাস রচনা সহজ কাজ নয়। (খান, ২০১৯ : ১৪)

উনিশ ও বিশ শতকে বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা

উনিশ শতকের শেষার্ধ হচ্ছে বাংলার নব্য কাব্য ও কথা সাহিত্যের উদ্বোধনের যুগ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধ হলো উক্ত কাব্য ও কথাসাহিত্যের পরিণতি এবং ইতিহাস সাহিত্যের উন্মেষের যুগ। বাংলা কথা সাহিত্যের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা ইতিহাস রচনার প্রথম প্রেরণাদাতা। এ প্রেরণা অধিকতর প্রবলতা লাভ করে উনবিংশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে। (সেন, ১৯৯২ : ১)

প্রাচীনকাল থেকে বাংলার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাজনিত আঞ্চলিকতা ও অন্যদিকে শ্রেণিবিন্যাসজনিত সামাজিক বিচ্ছেদ এবং পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতা নিয়ে ধর্মের দ্বন্দ্ব বাংলার লোকসমাজকে বহুধা বিভক্ত করে তোলে। ফলে সমস্ত অঞ্চল ও ধর্মগত বিচ্ছেদ জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে বাঁধা হিসেবে কাজ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলার ইতিহাসে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব একটি বিশাল ঘটনা। চৈতন্যকে আশ্রয় করে বাংলায় জাতীয় ঐক্যচিত্তের উদ্ভব ঘটে এবং বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনার প্রাথমিক উদ্যোগ দেখা যায়। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ চৈতন্যদেব এবং তার পারিষদদের চরিতকাব্যগুলো। এগুলো দৃশ্যত ধর্মগ্রন্থ হলেও ইতিহাস রক্ষার তাগিদেই রচিত হয়েছিল। (পূর্বোক্ত, ১৯৯২ : ৭)

প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে ধর্ম ও সমাজচিন্তা মূলত প্রাচীন ঐতিহ্য ও মতকে সংরক্ষণের মাঝে সীমায়িত থাকতে দেখা যায়। সেই জায়গায় প্রথম তরঙ্গাঘাত আসে উনবিংশ শতকের প্রথম পাদকে। যার অগ্রসরমান ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রবর্তিত ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁরা বাংলার সমাজ মানস গঠনের ক্ষেত্রে এক নব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এবং একথা অনস্বীকার্য যে, ব্রাহ্ম সমাজ যথার্থ ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জনে সমর্থ হয়েছিল এবং তার ইতিহাসও পাওয়া যায়। (বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন ঃ ঘোষ, *নবজাগৃতি* :১৯৪৮)

জাতীয় চিত্রে ইতিহাস রচনার প্রেরণা আসে দুইভাবে। যখন কোন জাতি তার ব্যুহবন্ধ জীবনে ঐক্যশক্তিকে উপলব্ধি করে এবং সে শক্তিকে নানা সাধনার মধ্যে কর্মে রূপ দেয়, তখন তার সেই উপলব্ধি ও সাধনার ফলকে ইতিহাস প্রকাশ না করে পারে না। তখন যে ঐতিহাসিক চেতনা সঞ্চারিত হয় এবং যে ইতিহাস লিখিত হয় তা হচ্ছে যথার্থ ইতিহাস, অর্থাৎ জাতীয় জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ। আবার যখন কোন জাতি দীর্ঘকালীন সুপ্তির অবসানে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে কর্ম সাধনায় উদ্যত হয় তখনও সে তার অতীত ইতিহাস রচনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। কেননা বিগত কালের ইতিহাসই হচ্ছে অনাগত কালের ইতিহাস রচনার প্রেরণা ও শক্তি। বাঙালির ইতিহাস রচনার সমস্ত প্রয়াসই এই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। (সেন, ১৯৯২ : ১৩)

মূলতঃ উনিশ শতকে বাংলায় ইউরোপীয় শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শনের প্রভাবে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে। বাংলায় স্থবির সামন্তঘেষা আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পটভূমিতে ব্রিটিশদের নিয়ে আসা পুঁজিবাদী উৎপাদন কৌশল এক নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে। যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে বাংলায় নতুন ভূমিকেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিকাশ, নতুন শিক্ষা পদ্ধতির প্রসার অর্থাৎ নব্য আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়। উনিশ শতক থেকেই ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বহু জিজ্ঞাসায় পরিপূর্ণ। বাংলা ইউরোপীয় এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্কৃতি আসে ইংরেজ রাজশক্তির মাধ্যমে। বাঙালিদের আধুনিক মনন তৈরিতে পাশ্চাত্যের ভূমিকা ছিল প্রবল। (মঞ্জুর, ১৯৯৭ : ১)

১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজদের দ্বারা। এর মধ্যদিয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষ, তার সমাজ, সংস্কৃতি, প্রকৃতি সম্পর্কে ইংরেজদের অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির পথ অনুসরণ করেই বাংলা ও ভারতের ইতিহাস রচনা ও গবেষণায় ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কর্মকান্ড শুরু হয়। বাংলা ও ভারতের আধুনিক ইতিহাস তত্ত্বের বিকাশে এ সকল ইংরেজ ঐতিহাসিকদের গবেষণা কর্মের প্রভাব অপরিসীম এবং বলা যায় যে, বাংলা ও ভারতে ইতিহাস গবেষণার আধুনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এসকল ঐতিহাসিকেরা। (পূর্বোক্ত, ১৯৯৭ : ১)

ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাশ্চাত্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার বাংলাতেই প্রচলিত হয়। উনিশ শতকে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা সমগ্র ভারতকে প্রভাবিত করে এবং বাংলার এ ভূমিকা ইউরোপীয় রেঁনেসার ক্ষেত্রে ইটালির সাথে তুলনীয়। বাংলার নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য হলো সংস্কৃত ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ। (ত্রিপাঠী, ১৯৯৪ : ৪৯)

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সূচনা ঘটে বাংলার ইতিহাস চর্চার আধুনিক যুগের। উনিশ শতকের বাঙালি ঐতিহাসিকদের ইতিহাস অনুসন্ধান ও গবেষণায় মূলত বাংলা তথা ভারতের পূর্বের ইতিহাস ও ঐতিহ্যই গুরুত্ব পেয়েছিল। নিজ দেশের অতীতের ইতিহাস আবিষ্কার এবং অন্যদিকে, ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ভারত গবেষণার প্রভাব অর্থাৎ ইতিহাস পুনর্গঠন তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। (মঞ্জুর, ১৯৯৭ : ৩)

ইতিহাসের রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে সুনির্দিষ্ট কালপঞ্জীতে আবন্ধ করা গেলেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও চিন্তা-চেতনার বিকাশকে সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। বস্তুত সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ গতিশীল এবং মননশীলতা সময়ের প্রেক্ষাপটে আবর্তিত হয়। বিশেষ করে একটি যুগের মননশীলতা আর্থ-সামাজিক পটভূমি, চিন্তা-চেতনা ও দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিধিতে গড়ে ওঠে। (পূর্বোক্ত, ১৯৯৭ : ৪)

এরপর উনিশ শতকের আবেগ ও অতীতমুখী মনোভাব ত্যাগ করে বিশ শতকে এসে বাঙালি ঐতিহাসিকদের ইতিহাস চর্চা গুণগত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যদিয়ে একটি স্থিতাবস্থায় পৌছায়। একটি সুনির্দিষ্ট সময় কালের সীমানায় একজন ঐতিহাসিকের চিন্তাকে সে সময়কার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিধারা প্রভাবিত করে। তার পারিবারিক জীবন, অর্থ উপার্জনের চিন্তা, সামাজিক বোধ, শিক্ষা এবং সমসাময়িককালের ভাবনা দ্বারা ব্যক্তি প্রভাবিত হয়। উনিশ-বিশ শতকের বেশ কয়েকজন ঐতিহাসিকের নাম পাওয়া যায় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মঞ্জুরের বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *'বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা'* গবেষণাকর্ম থেকে। তাঁরা হলেন যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৩০), পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), সুরেন্দ্রনাথ

সেন (১৮৮৮-১৯৬২), রমেশ চন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০), নীহাররঞ্জন রায় (১৯৩০-১৯৮১)। (পূর্বোক্ত, ১৯৯৭ : ৫)

তবে একমাত্র নীহাররঞ্জন রায় বাদে বাকী সবাই-ই কোন না কোনভাবে ইংরেজ শাসকদের প্রতি মোহগ্রস্থ ও দুর্বল ছিলেন। কেউ কেউ ছিলেন হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত।

অন্যদিকে এই সময়ের মুসলিম ইতিহাসবিদের মধ্যে আবু মুহাম্মদ হবিবুল্লাহর নাম উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মঞ্জুর তার গ্রন্থে। যদিও প্রকৃত ইতিহাস রচনা বলতে যা বোঝায়, তার চর্চা এ সময়ে খুব কম মুসলিমই করেছেন। ইতিহাস রচনার চেয়ে মুসলিম লেখকগণ বোধ হয় এসময়ে ইসলামী জাতীয়তাবাদকে প্রণোদনা দেয়, এমন সাহিত্য ও লেখনী চর্চা করতে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। এসময় এ ধারার লেখকগণ ইতিহাস বলতে ইসলামের ইতিহাস কিংবা নবীজীর ইতিহাস রচনা করতেন। নিজেকে আরবের মুতাজিলা দার্শনিকদের উত্তরসূরী বিবেচনাকারী দেলোয়ার হোসেন মির্জা বিশুদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে যায় না, এমন আচারাদি পরিবর্তন ও বিলোপ সাধনের ওপর জোর দিয়ে বলেন- 'আমাদের জাতীয় অবক্ষয়ের কারণ খুঁজতে হবে আমাদের অতীতের ইতিহাসের মধ্যে।' (বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি, ১৯৯৯ : ৩০) তিনি ধর্মীয় গোড়ামী, মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। আবার পুরোপুরি ইতিহাস না হলেও ইসলামি বাংলা বলে পরিচিত আরবী, ফার্সি, উর্দু এবং বাংলা কথ্য ভাষায় রচিত ইসলামি পুথিঁগুলো তৎকালীন সমাজের চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। (পূর্বোক্ত : ৩১)। এসময় মুর্শিদাবাদের দেওয়ান ফজলে রাব্বি ১৮৯৩ সালে ফার্সি ভাষায় '*হাকিকাতে মুসলমান এ বাংলা*' রচনা করেন। এতে তিনি ১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের কারণ হিসেবে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য হেনরি রেভারলি যে মন্তব্য করেছিলেন, তার বিরোধিতা করেন। হেনরি বাংলার মুসলমানের নৃ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে মতামত দেন যে-বাংলায় ইসলাম প্রচারের সাফল্য হলো বিপুলসংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে। (খান, ২০১৯ : ২৩)। মোট কথা হলো, হিন্দু লেখকদের মতো এসময়ের মুসলিম লেখকগণও ইসলামী জাতীয়তাবাদকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে সরে আসতে পারেনি। তাই দেলোয়ার হোসেন মির্জার মতো উদার ধর্মীয় চেতনায় বিশ্বাসী ব্যক্তিও হিন্দু-বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। আবার ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মতো ব্যক্তি যিনি একসময় কট্টর কংগ্রেসী ছিলেন, তিনিও অবদান রাখলেন মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবে। আর মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই সবকিছুর মূল কারণ হলো- এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যকার আত্মপরিচয় সংক্রান্ত দোদুল্যমান চিন্তাচেতনা। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর বলেন,

> বাঙালি মুসলমানদের আত্মপরিচয় (Identity) সমস্যা এমন এক ধরনের সমস্যা যার অস্তিত্ব বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে নেই। বস্তুত এ সমস্যা, থাকে প্রকৃতপক্ষে সংকট নামেই অভিহিত করা দরকার। শুধু বাঙালি মুসলমানদেরই বিশেষত্ব নয়। এ সমস্যাও সংকট অল্পবিস্তর সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদেরই সমস্যা। (ওমর, ২০০৯ : ১১২)

আসলে বাঙালি মুসলামানরা সমসময়ই এই আত্মজিজ্ঞাসায় ভুগে থাকে যে তারা আসলে আগে বাঙালি না মুসলমান (Jahangir, 2002 : 122)

একদিকে মুসলিম লেখকদের হিন্দুবিরোধী লেখনী এবং অন্যদিকে হিন্দু লেখকদের মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব এবং ভারত শুধুমাত্র হিন্দুদের প্রকৃত বাসভূমি এমন মানসিকতার স্পষ্টতই ভারত তথা বাংলায় জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িকতার সূচনা করে।

ধর্ম, রাজনীতি ও ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার যোগসূত্র

আমাদের সমাজে পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনেও ধর্ম এ অঞ্চলের রাজনীতির প্রকৃতি, গতিবিধি ও সম্পর্ককে নির্ধারণ করছে। কারণ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তরে ধর্ম-বিষয়ক পণ্ডিত রয়েছেন। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় শিক্ষক নন অথচ কঠোর ধর্মীয় জীবনব্যবস্থায় এবং কখনও কখনও উগ্রতায় বিশ্বাসী এমন ব্যক্তিও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। ফলে সকলের অজান্তেই ঘটে যাচ্ছে ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকীকরণ ও বিকৃতি। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে ধর্মকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকীকরণের রাজনীতি নতুন নয়। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ণ পরিণতি। জ্যাকবিন দলের প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় শাসকশ্রেণী ও সমাজের উপরের তলায় লোক ভীত হয়ে ওঠেছিল। আর এ সময় এই বিপ্লবকে প্রতিরোধ করতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সক্রিয় প্রাণবান ধর্ম বিশ্বাসের। কেননা আঠারো শতকের বিপ্লবের ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে যে রেনেঁসাস বা পুর্নজাগরণের ছোঁয়া লেগেছিল, তার ভিত্তি ছিল মানুষ ও ইহকাল, ধর্ম বা পরকাল নয়। সক্রিয় ও উদ্দীপনাময় ধর্মীয় বিশ্বাসের অভাব মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে সমাজের কুসংস্কার, অনাচার ও অসংগতির বিরুদ্ধে বিপ্লবী করে তোলে। আর তখনই ধর্মের অন্যরূপ প্রকাশিত হয়, সেখানে ধর্ম একটি তীব্র মানসিক আবেগে পরিণত হয়। ফলে মানুষ ইহজাগতিক দুঃখ কষ্ট ভুলে পারলৌকিক শান্তির জন্য আত্মনিয়োগ করে, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার স্থলে তখন জায়গা হয় ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও তাঁর কাছেই আত্মসমর্পনের ধারণা। মূলতঃ জীবন্ত ধর্ম বিশ্বাসের পুনরুদ্ধারই মানুষকে ইহলৌকিক চিন্তার চেয়ে আমার শান্তির প্রতি অধিক মনোনিবেশ করতে শেখায়। কিন্তু বিপ্লব থেকে আত্মরক্ষার্থে ধর্মযাজক ও শাসক শ্রেণীর এই ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতিও পরিপূর্ণ পূর্ণতা লাভে সমর্থ হয়নি। কেননা সাধারণ লোকের আদর্শ তাতে পুরোপুরি স্তিমিত করা যায়নি। যার কারণে ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন না এনে উপায় ছিলনা।

অন্যদিকে ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শিক দিকই হচ্ছে ইহজাগতিকতা। এটি একটি দার্শনিক প্রত্যয়ও বটে। এর মূল ভিত্তি হিসেবে ছিল রেনেসাঁসের ধারণা। এ প্রত্যয় ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেনা, তবে এতে প্রাধান্য থাকে মানুষের ইহজাগতিক ধারণা। এর শ্লোগান ছিল-'সীজারকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দায়, ঈশ্বরকে দাও তার প্রাপ্য'- অর্থাৎ ধর্ম ও রাজনীতিকে এক করা যাবে না। ওরা উভয়েই থাকবে, তবে স্বতন্ত্র অবস্থানে। ধর্ম নিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনা মানুষকে অসাম্প্রদায়িক করে গড়ে তোলে, আর অসাম্প্রদায়িক হলেই কেবল ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব, ইতিহাস চর্চাও সম্ভব। (আহমেদ, ২০১৫ : ১৮৬-১৮৭)

বাঙালি ইতিহাস চর্চায় সাম্প্রদায়িক চৈতন্যের সূচনা

আঠারো শতকের শেষের দিকে আমাদের দেশে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় সে ধারণা চালু হয় তার সূচনা করেন কিছু প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ বা Orientalist এবং ভারততত্ত্ববিদ (Indologist) জোনাস, প্রিন্সেপ, কোলব্রুক কিংবা উইলসন এরা সবাই প্রাচীন ভারতকে মহিমান্বিত করে বর্ণনা করেছেন। আবেক দল রয়েছেন, যা উপযোগিতাবাদী নামে পরিচিত। এরা প্রাণপনে দেখাতে চেয়েছেন যে (Utilitazion)

ব্রিটিশদের সংস্পর্শে এসে ভারতীয়গণ আধুনিক হতে পারবে। এ মতের উগ্র প্রবক্তা জেমস মিল। আর ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ (Nationalist Historians) মিল ও এ ঘরানার ঐতিহাসিকদের সমালোচনা করে এবং বিশ শতকের গোঁড়ায় এবং এরপর প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদদের সাথে যুক্ত হয়ে প্রাচীন ভারতের গুণকীর্তন করে এ সময়কে হিন্দুযুগ নামে সাম্প্রদায়িক তকমা বসিয়ে দেন। (নিয়োগী, ১৯৯১ : ৭)

প্রাচ্যবাদীরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমর্থন করতেন কারণ হিতবাদীদের সাথে বিতর্কে তারা ক্রমশ পরাজিত হচ্ছিলেন। কারণ হিতবাদীরা ছিলেন উনিশ শতকের বিশেষ প্রভাবশালী একদল ব্রিটিশ দার্শনিক। তারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের আগমনের বিশেষভাবে সমর্থক ছিলেন। হিতবাদীদের মধ্যে জেমস মিল ঐতিহাসিক চিন্তাধারার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তার 'ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস' এর তাৎপর্যপূর্ণ দিক- তা এক অর্থে ভারতীর ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার সূচনা করেছিল এবং ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করার রীতি প্রচলন করেন। এ তিনটি অধ্যায় হলো হিন্দু সভ্যতা, মুসলমান সভ্যতা ও ব্রিটিশ সভ্যতা (বিচিত্র হলো- খ্রীষ্টান সভ্যতা নয়)। (রোমিলা থাপার, হরবংশ মুখিয়া, বিপিনচন্দ্র, ১৯৭৬ : ১৪)

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো তারা কেউই মিলের পর্ব বিভাগ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেননি এবং এর মধ্য দিয়ে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে রাজনৈতিক ও রাজবংশের ইতিহাস চর্চায় নিমগ্ন থাকেন। (পূর্বোক্ত, ১৯৭৬ : ১৭)

এরই ধারাবাহিকতায় মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিকৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা এই লেখকগণ অনেকক্ষেত্রেই মুসলিমদের ভারতবর্ষকে নিজেদের দেশ বলে মানতে চাননা। এদের লক্ষ্য করেই যদুনাথ বলেন-তারা ভারতের মুসলমান, ভারতীয় মুসলমান নন। নিজের মনের মতো তথ্য চয়ন ও বর্জন বা বিকৃতি ইতিহাসবিদদের পক্ষে চরম অপরাধ হলেও রমেশ চন্দ্র মজুমদার যেমন হিন্দু ধর্মের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে লিখতে চাননি। তেমনি আব্দুল কাদের বদায়ুনীর মত পণ্ডিতগণ খুব সহজেই মন্তব্য করে বসেন যে, আকবর ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ করেছেন। (নিয়োগী, ১৯৯১ : ৯)

মুসলমানযুগে হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই 'জাতির' উদ্ভব হয়েছিল এবং আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার এর একমাত্র পরিণতি মনে করা হল হিন্দু ও মুসলমান অধিকৃত দু'টি রাষ্ট্রে ভাগ করা। একথা লক্ষ্য করা হলো না যে, ধর্মীয় সম্প্রদায় ও জাতি সমার্থক নয়। (রমিলা থাপার,হরবংশ মুখিয়া, বিপিনচন্দ্র, (অনুবাদ), ১৯৭৬ : ১৭) সর্বাধিক ক্ষতিকর হলো সেই ধরণের রচনা যার মূলে আছে সাম্প্রদায়িক বা প্রায় সাম্প্রদায়িক ধারণা। (পূর্বোক্ত, ১৯৭৬ : ২১) উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উপমহাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই ইতিহাস শিক্ষণের সময় ইতিহাস চর্চায় শৃংখলাবোধ সম্পর্কে প্রায় কিছুই ভালোভাবে বলা হয় না। সাধারণত পূর্বনির্বাচিত ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ হিসেবে ইতিহাসকে দেখা হয় এবং ঘটনা নির্বাচনের ভিত্তি বা প্রাসঙ্গিকতায় বিচার হয়না। আরেকটি কারণ হলো, ইতিহাসের কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকে প্রায়ই স্থান পায় না। (পূর্বোক্ত, ১৯৭৬ : ২১)

তাই যখন আমরা ইতিহাসচর্চার ধারা সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে পারব। যখন বিশেষ কোন শাসক বা শাসকশ্রেণির ইতিহাসমাত্র না হয়ে সমস্ত সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করবো, একমাত্র তখনই আমাদের ইতিহাস চেতনা প্রকৃতই এবং যুক্তিযুক্তভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারবে। (পূর্বোক্ত, ১৯৭৬ : ৪২) একথা

বাঙালির ইতিহাস চৈতন্যের বিকাশের প্রশ্নেও সমভাবে সত্য। বাস্তবিক অর্থে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ গভীরে প্রবেশ করতে না পারলে সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব ঘটে। (পূর্বোক্ত, ১৯৭৬ : ৫৫) জাতীয়তাবাদী মতবাদ বিশেষ গভীরে সঞ্চারিত হতে পারেনি বলে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব অটুট থেকে গেছে। প্রাত্যহিক জীবনে ধর্ম প্রভাবশালী বলেই মানুষ সাম্প্রদায়িকতাকে বেশি প্রাসঙ্গিক মনে করে। (পূর্বোক্ত, ১৯৭৬ : ৫৮)

ইতিহাস প্রণয়নে সাম্প্রদায়িকতা হলো পরোক্ষ জাতীয়তাবাদের একটি দিক এবং সেই সাথে সমসাময়িক সাম্প্রদায়িকতার প্রতিফলন। এর মূলে কাজ করেছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলমান জাতীয়তাবাদকে আরো অতীতে নিয়ে যাবার ফল। (পূর্বোক্ত, ১৯৭৬ : ৬৮)

সাম্প্রদায়িকতা

নির্দিষ্ট ধর্মমতবাদী গোষ্ঠী বা শ্রেণী 'সম্প্রদায়ের' অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজী 'Community' শব্দ থেকে শ্রেণীগত বা বর্ণগত বা ধর্মগত 'সম্প্রদায়' বোঝানো হয়ে থাকে। তবে ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে যোগসূত্র থাকলেও সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিষ্ঠা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ধর্মের আচার প্রথা ও তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা ও আস্থা থাকলে সেটি হয় ধর্মনিষ্ঠা। কিন্তু যখন ব্যক্তি কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিদের বিপক্ষে ও তাদের ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে, তখনই সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এক্ষেত্রে মূখ্য হল- সম্প্রদায়, ব্যক্তি নয়। নিজ সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠ মনে করার প্রবণতা এখানে বেশী কাজ করে। ধর্মনিষ্ঠার সাথে পারলৌকিক মুনাফা সংশ্লিষ্ট আর সাম্প্রদায়িকতার সাথে যুক্ত থাকে ইহলৌকিক লাভ। সাম্প্রদায়িক হওয়ার জন্য ধার্মিক হওয়ার প্রয়োজন নেই। সম্প্রদায়কেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা থেকে বেরিয়ে আসলেই কেবল অসাম্প্রদায়িক হওয়া সম্ভব। (পূর্বোক্ত, ২০১৫ : ১৮৬)

সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে জনমনে একটি ধারণা প্রচলিত যে, এটি মূলতঃ ধর্মীয় চিন্তা থেকে উদ্গত কিন্তু এর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এপ্রসঙ্গে বদরুদ্দীন ওমর মনে করেন,

> ধর্ম নিষ্ঠার সাথে সম্পর্ক আছে ধর্মীয় তত্ত্ব এবং আচার বিচারের সাম্প্রদায়িকতার যোগ হচ্ছে সম্প্রদায়ের সাথে। (উমর, ১৯৬৬ : ৯)
>
> অন্যদিকে ধর্মের প্রতি ভীরুতা ও ধর্ম নিষ্ঠা মূলতঃ মানুষকে পরকালমুখী করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার সবটুকুই ইহলৌকিক লাভের সাথে জড়িত। তাই সাম্প্রদায়িক হতে ধর্মভীরু হওয়ার প্রয়োজন নেই বরং এ অর্থে সাম্প্রদায়িকতা নিজেই পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ। (পূর্বোক্ত, ১৯৬৬ : ৯)

ইংরেজরা ভারতবর্ষে যে নতুন জীবনযাত্রার সুযোগ এনে দিয়েছিল তাতে সকলের সমান অংশগ্রহণ ছিল না। এমনকি সকলকে আহ্বানও করা হয়নি। সে অর্থে তৎকালীন সময়ে রাজার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল মুসলমানরা সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদের সুনজরে তারা ছিল না। অন্যদিকে অমুসলিম জনগণ নতুন এই জীবনাচরণে প্রবল উৎসাহে যোগ দিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় আবার দুই পক্ষ এক যোগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। কিন্তু এ উদ্দীপনা বেশীদিন টিকে ছিল না। এ সময়কার হিন্দু অগ্রসরতা এবং মুসলমান পশ্চাৎমুখীতাই সাম্প্রদায়িকতার সূচনা করে। বদরুদ্দীন উমর যেমনটা লিখেছেন-

> ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হল সংকীর্ণ শাসন তান্ত্রিক পথে এবং পৃথক নির্বাচনের মহিমাময় হিন্দু-মুসলমানের এক পথ ধরে চলার পথ হলো বন্ধ। (পূর্বোক্ত, ১৯৬৬ : ১৬)

বদরুদ্দীন ওমর আরও লিখেন,

> শাসনতান্ত্রিক পথে মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে অগ্রসর না হয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যদি বৃহত্তর বিপ্লবের পথে চালিত হতো তাহলে পৃথক নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে এতখানি বিষাক্ত করতে সমর্থ হতো না। (পূর্বোক্ত, ১৯৬৬ : ১৬)

মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক ভিত্তি যদি মজবুত হয় তবে উন্নত শ্রেণীর সৃষ্টি হবে। তখন শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে জাতীয় উন্নতির সূচনা ঘটবে। বদরুদ্দীন ওমরের ভাষায়,

> যে পর্যন্ত না দেশের উন্নতি শ্রেণী এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র জাতির উন্নতির পথে চালিত হবে, সে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যার আর্থিক এবং সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি অটল থাকবে। সাম্প্রদায়িকতার অগ্নিশিখাকে নির্বাচিত করার জন্য তাই প্রয়োজন দেশের আর্থিক জীবনের বৈপ্লবিক রূপান্তর। (পূর্বোক্ত, ১৯৬৬ : ১৮)

সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় রাষ্ট্রের সম্পর্কে বদরুদ্দীন ওমর লিখেছেন,

> ধর্মের প্রতি ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান, বিশেষতঃ মুসলমান মধ্যবিত্তের অনুরাগের মূল কারণ ভারতীয় আন্দোলনে ধর্ম কতকগুলি বিশেষ অবস্থার মহিমায় রূপান্তরিত হলো মধ্যবিত্ত স্বার্থসিদ্ধির নিশ্চিত হাতিয়ারে এক্ষেত্রে তাই ধর্মীয় প্রশ্ন স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি এবং চরিত্রকে অনেকখানি নির্দেশ ও গঠন করতে সক্ষম হল এ কারণে নয় ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান অন্যান্য দেশের লোকের তুলনায় অধিকতর ধর্মগত প্রাণ।
>
> রাজনীতি সর্বপ্রথম সার্থক ভাবে সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলো বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও অন্যান্য লেখায় তাঁর আনন্দমঠই ভারতীয় মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে সর্বপ্রথম হলো উৎকর্ষ সাম্প্রদায়িকতা। (পূর্বোক্ত, ১৯৬৬ : ২১-২২)

ইংরেজ আমলে যে বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, যুদ্ধ, মহাবীর, অশোক, সমুদ্রগুপ্তের পুনরুদ্ধার হয়, তার ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাদের পূর্ব গৌরবের ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত হলেও তা আকৃষ্ট করে নি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজকে। বরং জ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষায় আলোকিত হয়ে তারা আরব-পারস্যের ধর্ম চেতনা ও সংস্কৃতি থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির যে প্রভাব তাদের ধর্মে ঘটেছিল সেটিকে আরও সুস্পষ্ট ভাবে ভিন্ন করতে শিখলো। (পূর্বোক্ত, ১৯৬৬ : ২৪)

উপমহাদেশে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম সংস্কৃতির বিস্তার প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন ওমর যেমনটা লিখেছেন,

> ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান যে দুই ভিন্ন জাতি এক প্রমানস্বরূপ তিনি যে সমস্ত যুক্তির অবতারনা করেছিলেন এবং ভারতীয় সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের থেকে তাঁর যুক্তির স্বপথে ধারণা নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয়।

> এজন্যই ভারতীয় রাজনীতির সর্ববৃহৎ সমস্যা হিসেবে তিনি দেখেছিলেন সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমস্যাকে নয়। (পূর্বোক্ত, ১৯৬৬ : ৩০)

পাকিস্তানের সৃষ্টির পর এর নীতি নির্ধারনের ধরণ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেন,

> স্বাধীনতা পূর্ব যুগে এদেশের ধর্মীয় চিন্তা, রাজনীতি ও সংস্কৃতি চিন্তা সবকিছুই ছিল একই চিন্তাধারায় মিশ্রিত ও প্রবাহিত। এ চিন্তাধারার ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক প্রভাবেই ছিল মুখ্য। রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছুই ছিল মোটামুটি ভাবে তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের বাস্তব জীবন ক্ষেত্রে যা ছিল লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন এসেছে তাদের কোনটিই কিন্তু ধর্ম চিন্তার ফল নয়। সরকার পথ থেকে মাঝে মাঝে ধর্মকে নানা ভাবে গুরুত্ব দেয়ার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রের জীবন বাস্তবতাঃ ধর্মীয় নির্দেশ নিয়ন্ত্রিত হয়নি। (পূর্বোক্ত, ১৯৬৬ : ৪১)

> তাই 'ধর্মের দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অনেক কিছু বললেও সংস্কৃতি বলতে তাঁরা আসলে যা বোঝাতে চান তা ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন। ... সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বোঝাতে চায় যে তত্ত্বগত ভাবে তারা ধর্মানুগত কিন্তু তাদের ব্যবহারিক জীবনে সে আনুগত্যের কোন দেখা মেলে না। এ কারণেই সত্যিকার ধর্মনিষ্ঠ এবং ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির জীবনে সাধারণ ভাবে সততার একটা স্থান থাকলেও সাম্প্রদায়িকতাবাদীর জীবন অসৎ এবং মিথ্যাময় হতে বাধ্য'। (উমর, ১৯৬৯ : ৩)

যে কোন সমাজ ও দেশের সংস্কৃতি যে তার আর্থিক জীবনের দ্বারা কতখানি নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির উন্মেষ তারই এক অনস্বীকার্য উদাহরণ। এ কারণেই ইসলাম ধর্মের মধ্যে তথাকথিত মুসলিম সংস্কৃতির মূলসূত্র অনুসন্ধান করলে দেখা যায় অতি সহজেই বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। এ বিভ্রান্তিকে অতিক্রম করতে হলে তার সন্ধান করতে হবে এ দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনভূমিতে। (পূর্বোক্ত, ১৯৬৯ : ৭)

উপসংহার

সবশেষে এডওয়ার্ড হ্যালেট এর কথার সাথে কথা মিলিয়ে বলা যায়- 'ইতিহাস জানার আগে ঐতিহাসিককে জানো।' (বিস্তারিত দেখুন, ই এইচ কার, *কাকে বলে ইতিহাস*, ১৯৯১ : ১-২১)। ইংরেজ শাসনের ফলে উনিশ শতকে এসে বাঙালির চৈতন্যে ইতিহাস চর্চার প্রবণতা শুরু হলেও সেটি কট্টর জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক চৈতন্য রূপ লাভ করে। সুতরাং এই সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য উনিশ ও বিশ শতকের সূচনালগ্নে বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারাকে অনেকটাই বিকৃত করে প্রকৃত ইতিহাস চর্চার মানদণ্ড থেকে বিচ্যুতি ঘটাতে প্রণোদনা যুগিয়েছিল। বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাসচর্চার সবচেয়ে বড় দুই বিশিষ্ট্য হলো- তথ্যের প্রতি অবিচল অভিনিবেশ ও নিষ্ঠা এবং তথ্য বিশ্লেষণে যুক্তির সঠিক প্রয়োগ। (নিয়োগী, ১৯৯১ : ১৬)। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষত শেষ দিকে থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক কালে ভারতের জনগণের, মধ্যকার উগ্র জাতীয়বাদী চিন্তাচেতনা তৎকালীন ইতিহাসচর্চাকে ব্যাহত করেছে এবং সাম্প্রদায়িকীকরণ করে বিকৃত করেছে। এর প্রভাব একমুখী ছিলো না, বরং ভিন্ন ভিন্ন খাতে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প ছড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ থেকে এই সংকট হিন্দু-ব্রাহ্ম, হিন্দু-খ্রীষ্টান ইত্যাদি নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ধর্মীয় বিভক্তির সাথে আরো যুক্ত হয়েছিল ভাষা ও জাতিগত

সাম্প্রদায়িকতা। এরই ফলশ্রুতিতে সূচনা হয়েছিল ইতিহাস রচনায় নির্দিষ্ট ধর্ম, গোষ্ঠীভিত্তিক সাম্প্রদায়িক আলোচনা, যা পরবর্তীতে নির্দিষ্ট দলীয় মতের সূচনা করে এবং অনুসারীর সৃষ্টি করে। অথচ এই ধরণের একপার্শ্বিক ইতিহাস, আর যাই হোক, ঐতিহাসিকসুলভ আবরণ থেকে রচনাকারী এখানে বিচ্যুত থাকে। সুতরাং ইতিহাস যেন নিজের পছন্দমতো ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু না হয়, বরং ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সচেতনতা, দায়িত্বশীলতা, সত্যবাদিতা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অতীতের বিচার ও বিশ্লেষণ যেন হয় ঐতিহাসিকদের আদর্শিক মানদন্ড। (পূর্বোক্ত, ১৯৯১ : ৪)

তথ্যপঞ্জি

B K Jahangir, Nationalism, *Fundamentalism and Democracy in Bangladesh,* ICBS, Dhaka, November 2002.

অমলেশ ত্রিপাঠী, *ইতালীর র‍্যনেশাসঁ বাঙালীর সংস্কৃতি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪।

আইরীন আহমেদ, *ইতিহাস বিকৃতি ও সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রবণতা ১৯৭২-১৯৯০: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইতিহাস সম্মিলনী প্রবন্ধ সংগ্রহ ১, ২০১৫।

আকবর আলি খান, *বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য, একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ*, প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯।

ই এইচ কার, *কাকে বলে ইতিহাস*, কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯১।

গৌতম নিয়োগী, *ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা*, পুস্তক বিপনী, ২৭ বেনিয়াটোল লেন, কলকাতা, ১৯৯১।

নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, *বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন, ১৯৯৭।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২।

প্রবোধচন্দ্র সেন, ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, *বাংলার ইতিহাস সাধনা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯২।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খন্ড, কলকাতা কামিনী প্রকাশনালয়, ১৯৯১।

বদরুদ্দীন ওমর, *বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪।

বদরুদ্দীন ওমর, *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ* ২, সূবর্ণ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৯।

বদরুদ্দীন ওমর, *সাম্প্রদায়িকতা*, জনমৈত্রী পাবলিকেশনস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৬৬।

বদরুদ্দীন ওমর, *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*, মাওলা ব্রার্দাস, ঢাকা, ১৯৬৯।

বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, কলকাতা, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৮।

মমতাজুর রহমান তরফদার, সালাহ্উদ্দীন আহমদ, *ইতিহাসের দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০১১।

মযহারুল ইসলাম, *প্রসঙ্গ কথা*, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, *সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।

মুনতাসীর মামুন, *উনিশশতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, বিলাস, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৬।

রোমিলা থাপার, (অনুবাদ-বজ্রদুলাল চট্টোপধ্যায়), *পূর্বকাল ও পূর্বধারণা*, ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৭৭।

রোমিলা থাপার, হরবংশ মুখিয়া, বিপিনচন্দ্র (অনুবাদ), *সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, তনিমা সরকার কে.পি. বাগচী এ্যান্ড কোং কলকাতা, ১৯৭৬।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালান্তর*, তোফাজ্জল হোসেন (প্রকাশক), বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০১।

শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *ইতিহাসের মুক্তি*, বিশ্বভারতী, ৬/৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, ১৯৫৭।

সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, কাজল বন্দোপাধ্যায়, (উপদেষ্টাঃ সালাহউদ্দিন আহমদ), *বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিঃ ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সংকট*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা, ১৯৯৯।